ATMADEEP



An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 874-881 Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.079



কল্যাণী ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারী পরিসর: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

क्रिप (प्रच, गत्वस्क, वाश्ना विভाগ, विश्वता विश्वविদ्यान्य, विश्वता, ভाরত

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025

©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

21st century is the age of technology-science-art-modernity-ultra modernity. Social civilization is rapidly advancing on the path of super ultra-modernity. The environment, people, people's thoughts, values, views and the entire society are changing with the civilization. The reflection and influence of this changing society is also observed in literature. The novel world of Bengali literature of Tripura is not so different from it. The novelists of Tripura acknowledge the influence of the contemporary era and bring out the civilization-society-time in their literary works. In their novels, sometimes the present is picturised, sometimes the images of the past are visualized through reminiscences. Sometime the story of happiness, sorrow and painful or happy journey of life of a particular gender is also symbolized in literature. In this article, an effort has been made to highlight how the position of women has changed in the ever-changing context of Tripura in the light of the novel 'Langtarai Queen' written by Kalyani Bhattacharya, one of Tripura's eminent novelists. Bhattacharya's work, the position of women in the contemporary social, political and economic context is well presented. The novel narrates the lives of three generations of Bengali women in Tripura after its accession to India as a state after independence. Besides, the suffering and helplessness of the women of the royal family of Tripura have been skilfully blossomed in the novel. No matter how modern we are, women are still trapped in the cage of patriarchy behind modernity. Novelist Kalyani Bhattacharya has presented the stories of these captives in her novel in her own style. Kalyani Bhattacharya, a modern-minded writer, left time behind and tried to paint a picture of the future in the novel. Various aspects of women's life have come up in the novel in a simple manner. All these issues are tried to explain and analyse in this article.

Keywords: 21st century, Society, Patriarchy, women, modernity, self-crisis, Tripura.

একুশ শতক সর্বতোভাবেই প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-শিল্প-আধুনিকতার যুগ। দ্রুতগতিতে সমাজ-সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে অত্যাধুনিকতার পথে। সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে পরিবেশ, মানুষ, মানুষের ভাবনাচিন্তা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি তথা সমগ্র সমাজ। এই পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সাহিত্যে। বিশ শতকে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা কাজ করছিল একুশ শতকে তা খানিকটা স্তিমিত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীন ভারতের নবরূপে প্রকাশ, বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ, শিল্প ও প্রযুক্তিতে ক্রমগ্রসরতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয় প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয় সাহিত্যক্ষেত্রও। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য জীবনকে শৈল্পিকরূপে প্রকাশ করে বলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাস্তব জীবনকে ভিন্ন রূপে, মাত্রায়, আঙ্গিকে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে পর্ব-১, সংখ্যা-৪, মার্চ, ২০২৫

অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যটি এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রের দাবি রাখে। বিভিন্ন জাতি-জনজাতির মিশ্রণে গঠিত এই রাজ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী। আনুমানিক ৫০০ বছর ধরে স্বাধীন ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা রাজভাষার সন্মান পেয়ে আসছে। রচিত হয়েছে বহু বাংলা কাব্যগ্রন্থ, ইতিহাস, গদ্য ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সাথে অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্ত হবার পর ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। জনসাধারণের যাপনচর্চায় এসেছে নতুন মোড়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে হিন্দু বাঙালিদের অভিবাসন প্রক্রিয়া ত্রিপুরার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে সাহিত্য অঙ্গনেও। সেখানে উঠে এসেছে নতুন নতুন ভাবনা, ক্ষেত্র ও জীবনবোধ।

একুশ শতকে ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে ত্রিপুরার জনজীবন, ব্যক্তিমানুষের জীবনবোধ, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের সমস্যা ও সংকট, পরিবর্তিত মূল্যবোধ তথা জীবনকে দেখার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসজগৎও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার ঔপন্যাসিকেরা সমকালীন যুগপ্রভাবকে স্বীকার করে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে তাঁদের রচনায় তুলে আনছেন সভ্যতা-সমাজ-সময়কে। তাঁদের উপন্যাসে কখনো উঠে আসছে বর্তমান, কখনো স্মৃতিচারণার মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হচ্ছে অতীতের ছবি, কখনো বা প্রতিকায়িত হচ্ছে কোন বিশেষ লিঙ্গের জীবনবোধ ও যন্ত্রণাময় যাপন। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল কালের গতিতে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান ও জীবনশৈলী ত্রিপুরার ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে কতটা বাজ্ময় হয়ে উঠেছে, তা তুলে ধরা। আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত ঔপন্যাসিকের একটি উপন্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যথা- কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'লংতরাই কুইন'।

বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বঙ্গসমাজে নারী জাগরণ ও নারী সমানাধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন নারী আন্দোলন নারীবাদী ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে নারীদের প্রান্তিকীকরণের পেছনে দায়ী পুরুষতন্ত্রকে সরাসরি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিভিন্ন নারী সংগঠন আইনিভাবে নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলনে ব্রতী হয়। প্রবর্তিত ও সংশোধিত হয় বহু আইন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, বিনোদন – সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। একুশ শতকে এসে নারী ক্ষমতায়ন আরও বিস্তৃত পরিধি লাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ,অর্থনীতি, রাজনীতি , বিজ্ঞান, ক্রীড়া সর্বত্রই নারীদের জয়জয়কার ঘোষিত হয়। নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই লড়াই সাহিত্যের পাতায় অঙ্কিত হয়েছে বহুবার বহুভাবে। ত্রিপুরার সাহিত্যিকগণও ত্রিপুরার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন নারীজগতের উপর আলোকপাত করেছেন স্বত্নে। আর এ ক্ষেত্রে উপন্যাস একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য 'ত্রিপুরার কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন,

"'উপন্যাস' অভিধার অন্তরালে রয়েছে কল্পনায় গড়া প্রতিবেদন যার ভিত্তি বাস্তবতা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সমান্তরাল আরেক বাস্তবের সুপরিকল্পিত অভিব্যক্তি। এই নির্মাণও সুক্ষণাবে লেখকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্বভাবত ত্রিপুরায় রচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনও সেখানকার স্বতন্ত্র বাস্তবের নিজস্ব আখ্যান।"

এরই প্রতিফলন দেখতে পাই কল্যাণী ভট্টাচার্যের লেখা 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসে।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম কল্যাণী ভট্টাচার্য (১৯৪১ খ্রি.-২০১৪ খ্রি.)। ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকা 'মানবী'র সম্পাদক কল্যাণী ছিলেন ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা- সর্বক্ষেত্রেই সিদ্ধহস্ত। তাঁর পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত একটি পত্রিকা যেখানে মহিলাদের রচনাই প্রকাশিত হত। কল্যাণী ভট্টাচার্যের রচনায় সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে নারীদের অবস্থান সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ২০০২ সালে 'মানবী' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসের পটভূমি বিশ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্ন থেকে একুশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত। ত্রিপুরায় তখন প্রবল অস্থিরতার সময় চলছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ত্রিপুরার জনজীবনকে করে রেখেছে বিপর্যন্ত। একদিকে কংগ্রেস- বামফ্রন্টের ক্ষমতা দখলের আগ্রাসী মনোভাব এবং অন্যদিকে জনজাতিদের একাংশের সরকারবিরোধী, বাঙালিবিরোধী মনোভাব নিয়ে উগ্রপন্থার পথ অনুসরণ- এই পর্ব-১, সংখ্যা-৪, মার্চ, ২০২৫

টালমাটাল ঝঞ্চাময় পরিস্থিতি তৎকালীন সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত। আলোচ্য উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের মূল কেন্দ্র লংতরাই পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি লজ যার নাম লংতরাই কুইন। ভলানটারী রিটায়ারমেন্ট নেওয়া কলেজ শিক্ষিকা অহনা বড়াল এই আখ্যানের কথক। বাহার বছর বয়সি অহনার দৃষ্টিতে ত্রিপুরার তৎকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতি ফুটে ওঠার পাশাপাশি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে কথকের বর্তমান সময়কাল অব্দি নারীদের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান তথা স্বাধিকার আদায়ের এক অনন্য ইতিহাস। এছাড়াও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্যা কুমারী যাজ্ঞসেনী চরিত্রটির মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজপরিবারে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিঙ্কিনি, অনন্যা, অদিতি, পিসিমা ইত্যাদি চরিত্রগুলো নারীদের চিরকালীন অস্তিত্বের প্রশ্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, সমযের প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত রূপান্তরশীল অবস্থানকে স্ব-ক্ষেত্র থেকে তুলে ধরেছে।

বিশ শতকের ত্রিপুরার জনজীবন নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী। নানা রাজনৈতিক ডামাডোলে ভেসে গেছে কতশত পরিবার। ১৯৮৮ সালে নানা ভাঙাগড়া ও দন্দ্র-বিরোধের পর গঠিত হয জোট সরকার। ১৯৯৩ সালে জোট সরকার ভেঙে গঠিত হ্য বামফ্রন্ট সরকার। এই প্রেক্ষিতে বাঙালিবিদ্বেষ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বাঙালি-জনজাতি সম্পর্ক ভ্যাবহ আকার ধারণ করে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হ্য ধলাই জেলা। উপন্যাসের পটভূমি লংতরাই পাহাড় এই ধলাই জেলার অন্তর্গত। আলোচ্য উপন্যাসের সময়কাল ১৯৯৫ সালের পরবর্তী সময় থেকে ২০০২ সাল অব্দি। উপন্যাসের কথক অহনা বড়াল অবসর সময় কাটাতে এসেছে লংতরাই পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট লজে। সেখানে থাকার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সাথে তার পরিচ্যু হয়। এই উপন্যাসে তিনটি ভিন্ন প্রজন্মের নারীদের অবস্থানের বিবর্তনের রূপরেখাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্যা কুমারী যাজ্ঞসেনী যোশী দেববর্মণ এবং অহনার পিসিশাশুড়ি আরতি দেবী। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেকার সময়ের ত্রিপুরার নারীদের তথা ত্রিপুর রাজপরিবারের নারীদের কথা জানা যায় যাজ্ঞসেনী চরিত্রের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঙালি নারীর চরম দুর্দশাম্য যাপনকথা বিবৃত হয়েছে পিসিমা আরতি চরিত্রের মাধ্যমে। কুমারী যাজ্ঞসেনী ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন নেপালের রাজপরিবারের সদস্য একজন মিলিটারি ব্যক্তিকে। কিন্তু ভালবাসা মানে যেন শুধু আঘাত, যন্ত্রণা আর বিশ্বাসের ভাঙন। রাজকুমারীও এই তিক্ত সত্যকে অতিক্রম করতে পারেননি। বিয়ের পর তিনি জানতে পেরেছেন তার স্বামী পূর্ব বিবাহিত। স্ত্রী সন্তান নিয়ে তার ভরন্ত সংসার রয়েছে নেপালে। ভালোবাসার মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে চুরমার হয়ে যান যাজ্ঞসেনী। কিন্তু চিরন্তন ভারতীয় নারীর আদর্শকে বজায় রেখে বিবাহের বাঁধন ছিন্ন না করে মেনে নিয়েছেন জীবনের অনভিপ্রেত সত্যকে, আপন করে নিয়েছেন সতীন ও তার সন্তান-সন্ততিদের। বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর নাতনির মেয়ের অকাল মৃত্যু হলে মা হারা সন্তান সুইটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। তাঁর শৃতিচারণায় উঠে আসে ত্রিপুরার সেইসব নারীদের কথা যাদের কথা কেউ কখনো বলে না। পুরুষের 'স্টেটাস সিম্বল' হয়ে কেটে যায় যাদের জীবন। তারা হলেন মহারাজাদের অন্দরমহলে বাস করা 'কাছুয়া বা কেইচ্ছা' রানি। তারা কারা, কোথা থেকে আসতেন এর সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। গ্রাম বা শহরের অভিজাত পরিবারের সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েদের রাজসৈন্য পাঠিয়ে আনা হত। এদের রাখা হত রাজকীয় ভাবেই,

> 'কালী পূজা, দুর্গা পূজাতে বলি দেবার জন্য যেমন পাঁঠা এনে যত্নে ঘাসটাস খাওয়ানো হতো, তাদেরও তেমনি যত্ন করা হতো'।^২

নামমাত্র বিয়ে করা এসব রানিদের রাখা হতো রাজকীয় প্রতাপ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য। রাজার অন্দরমহলে প্রবেশের পর তারা কখনো বাইরের পৃথিবীটাকে আর দেখতে পেত না। এসব রানিদের মৃত্যু হলে তাদের জন্য কান্নার মতও কেউ থাকতো না। তখন রাজকোষ থেকে কাঁদুনি ভাড়া করে আনা হতো বিলাপ করে কাঁদার জন্য। যুগ যুগ ধরে নারী এভাবে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, কত না পাওয়ার বঞ্চনাকে মেনে নিয়ে, বিশেষ কোনো একটু-পাওয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সাধারণ নারী থেকে রাজঅন্তঃপুরের নারী- সবাই এই গ্লানি আর অন্যায়ের সমান ভুক্তভোগী।

একই সময়কালের নারী চরিত্র পিসিমা একটি ভিন্ন দৃশ্যের কুশীলব। অম্বরের পিসিমা অর্থাৎ আরতি দেবী পূর্ব বাংলার পভিতবাড়ির দুই ভাইয়ের আদরের বোন। ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পর পর পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগত দাঙ্গা পর্ব-১, সংখ্যা-৪, মার্চ, ২০২৫ আত্মদীপ

শুরু হলে কুখ্যাত 'ভৈরবের পুল হত্যাকাণ্ডে' নিহত হন অম্বরের বাবা যে কিনা বোনের বিয়ে ঠিক করে ফিরছিলেন নিজ বাড়িতে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উম্মাদনা তখন মানুষের শুভবুদ্ধিকে মেরে ফেলেছিল, যার ফলে সারাদিন লক্ষ্মীপুজার উপোস করা আরতিকে পুজাের সময়ে ঠাকুরঘর থেকে তুলে নিয়ে পৈশাচিক লালসা মেটাতে বাধেনি বিধর্মী অমানুষগুলাের। মানসম্মান, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি সর্বস্ব হারিয়ে শূন্য হাতে অম্বরের জ্যাঠামশাই স্ত্রী,সন্তান, বান, ছাট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আগরতলায় পা রেখেছিলেন আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু নারী সর্বত্রই ভাগ্যপণ্য। সে হাক বিধর্মীর চোখে অথবা স্বধর্মী। তাই ক্ষোভে, রাগে, আক্ষেপে জ্যাঠামশাই বলে উঠেন,

'সব দেশের শকুনই মেয়েরার শরীর ঠুকরাতে চায়। এই ননীগোপালের চোখের দৃষ্টিটায় আমি তেমন একটা শকুনের চাহনিই দেখি। সে দেশে যা এখানেও তা। এ মাংসের বিকিকিনি সব দেশেই সমান'।°

এক নিষ্ঠুর সত্য এখানে নগ্নরূপে প্রকাশিত। পুরুষের কুকর্মের ফল চিরকাল নারীকে ভোগ করতে হয়। পিসিমাও তাই চিরকাল রয়ে গেলেন অবিবাহিতা, সাধারণ সমাজ থেকে আত্মনির্বাসিতা, সংকুচিতা। অন্যান্য পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুন্দর সংসারের। কিন্তু রাজনৈতিক অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তার সব স্বপ্ন। সমাজের লালসা আর নির্মমতা তাঁকে যে মানসিক আঘাত দিয়েছে, তার ভার বহন করে গেছেন সারাজীবন। বিনাদোষে কলংকের গ্লানি মাথায় নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে শুধু প্রাণধারণ আর দিনযাপন- এটাকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন নীরবে। কিন্তু সব স্বপ্ন সে আঘাতের নিচে চাপা পড়ে গেলেও মরে যায়নি। অবদমিত সব আকাজ্ফা শেষ বয়সে পাগলামির মধ্য দিয়ে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজেকে সাজিয়েছেন নববধূ রূপে, পরিবার-পরিজনদের কাল্পনিক শ্বশুরবাড়ির লোক ভেবে আচার-আচরণ করেছেন। কখনো বা প্রিয়জনকে সেই সম্মাননষ্টকারী ভেবে অপমানিত করেছেন। দুঃখে যন্ত্রণায় তখন অহনার মনে উচ্চারিত হয়েছে,

'আমি এখন মনে প্রাণে পিসিমার মৃত্যু কামনা করি। আমার উপাস্যর কাছে আবেদন করি- ঠাকুর ওকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।'⁸

অহনার প্রার্থনা মেনে নিয়েই যেন পিসিমা দুদিন অনবরত লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে পড়তে সকলের অলক্ষ্যে এই বিশ্বসংসার ত্যাগ করেন। সমাপ্তি ঘটে একটি কালো অধ্যায়ের। সমকালীন সামাজিক- রাজনৈতিক সংঘাতের পটে নারীজাতির আহুতি এই উপন্যাসে অসাধারণভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কুমারী যাজ্ঞসেনী ও পিসিমার পরবর্তী প্রজন্ম কথক অহনা শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাধীনতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনেকটাই এগিয়ে। বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী অম্বর বড়ালের স্ত্রী অহনা বড়াল একজন কলেজ শিক্ষিকা। তার পুত্র ও পুত্রবধূ আমেরিকায় বাস করে। সময়ের পূর্বেই রিটায়ারমেন্ট নেওয়া অহনা কখনো বাস করেন নিজ বাড়ি আগরতলায়, কখনো বা স্বামীর সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কখনো ইচ্ছে হলে বাস করেন লংতরাই পাহার্ট্রের উপর গর্ট্ তোলা ছোট লজ লংতরাই কুইনে। সেখানে বাস করার সময়েই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয়। সমাজ-সময়ের বিভিন্ন রূপ, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দৃষ্টিতে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে একজন স্বাধীন, সুখী নারী বলে মনে হলেও তাঁর আত্মবিশ্লেষণে ধরা পড়ে সেই প্রজন্মের নারীজাতির আত্মকথা। তৎকালীন সময়ের একজন শিক্ষিতা, স্বনির্ভর, আতাসচেতন নারীর যাপনযন্ত্রণা অহনা চরিত্রের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা মুখে যতই স্বাধীনতা আর শিক্ষার বুলি কপচাই না কেন, তখনও নারী পুরুষতন্ত্রের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই সদ্য কলেজ পাস করা অহনাকে পাত্রকে না দেখেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। রোমান্টিক স্বপ্ন চোখে নিয়ে সংসার করতে আসা অহনার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় বিয়ের রাতেই। অম্বরের প্রথম প্রেম হল প্রকৃতি, এই সত্যটিকে মেনে নিতে বলে অম্বর। অহনা বুঝতে পারে অম্বর বড়াল একজন অত্যন্ত নরম মনের ভালো মানুষ হলেও সে কখনোই তার মনের মানুষ হতে পারবে না। দুজনের শিক্ষা, সংস্কার, রুচিবোধ, জীবনশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু তাই বলে এই সম্পর্ককে অস্বীকার করার আম্পর্ধা তখনকার কোন নারীর ছিল না। অহনাকেও মেনে নিতে হয় এই নীরস সম্পর্ক। একজন আদর্শ স্ত্রীর মত স্বামীর সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কাটিয়ে দিতে হয় জীবন। কারণ মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াই মেয়েদের ধর্ম। যুগ যুগ ধরে নারীদের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্ত্রীর উপর দিয়ে

অম্বর পরিবেশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার কাজে বাড়ির বাইরে কাটিয়েছে অধিকাংশ সময়। অহনা ও অম্বরের সম্পর্কের এই দূরত্ব অহনাকে ঠেলে দিয়েছে একাকীত্ব ও অবসাদের অতল অন্ধকারে। সেখানে সে গড়ে নিয়েছে তার আলাদা একটি জগৎ।

নারীর সবচেয়ে প্রধান যে চাহিদা সেটি হল আত্মপরিচয়- আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা। অস্তিত্বের সংকট নারীর চিরকালীন সংকট। অহনা স্বাবলম্বী হলেও তাঁর যাপন-অভিজ্ঞতা তাকে এই সংকটের মুখোমখি দাঁড করায়। তাঁর আক্ষেপ.

'কৈশোর বা প্রথম যৌবনের যে সেলফ আইডেন্টিটি পাওয়ার স্বপ্ন, তা আর সফল হল কোথায়?' এই প্রশ্ন, এই অন্নেষণ, এই আকাজ্ফা অহনার একার নয়। সমস্ত নারীজাতি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে বহুকাল ধরে। সেই খোঁজা হয়তো শেষ হয়নি আজও। অহনা তাই বারবার প্রশ্ন করেছে,

'রমণী মানে কি একটা শরীর? রমণী মানে কি একজন সংসার রক্ষণাবেক্ষণকারী?'^৬

উত্তর পায় না সে। উপন্যাসিক বুঝিয়ে দেন 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'- এই আপ্তবাক্যটি স্টিরিওটাইপ হয়ে গেঁথে গেছে সমাজের মননে, মাথায়। তাই সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ত্রীকেই নিজের সাধ- আহ্লাদ, স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে স্বামীর ছায়া হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এরই উদাহরণ হিসেবে উপন্যাসে মধুমিতা, মিসেস পারেখ, অদিতি ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। অহনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণে তৎকালীন সময়ের নারীজাতির বাস্তব অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসিক কল্যাণী ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে উপন্যাসে বুঝিয়ে দিয়েছেন নারীর মানুষ হিসেবে স্বতন্ত্র সন্তার প্রতিষ্ঠা হতে তখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।

পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে পাওযা যায কিঙ্কিনি, বিজুলি, অনন্যা ইত্যাদি চরিত্রকে। সকলেই শিক্ষা দীক্ষায়, আধুনিকতায় অনেকটাই এগিয়ে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর আত্মকন্দ্রিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা ক্রমশই উচ্চাকাঙ্কী হয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। অহনার পুত্রবধূ বিজুলী স্বামীর সাথে আমেরিকায় বাস করে। সেখানে সে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত। তাই মা হওয়ার সময় তার নেই। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সে সন্তান লাভের জন্য স্যারোগেট মাদার বেছে নিয়েছে। কল্যাণী ভট্টাচার্য এখানে এসে যেন সময়কে অতিক্রম করেছেন। যে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন, সেই সময়ে স্যারোগেসি ধারণা ত্রিপুরার জনজীবনের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায ১৯৮৬ সালে আমেরিকায প্রথম স্যারোগেট মাদারের সাহায্যে একটি শিশুর জন্ম হয়। ভারতে এই আবিষ্কারের প্রচলন সরকারিভাবে শুরু হয় ২০০২ সালে যা আলোচ্য উপন্যাসটির প্রকাশকাল। বিজ্ঞানের উন্নত ব্যবস্থাপনার তাৎক্ষণিক এই প্রযোগ বাংলা সাহিত্যে বিরল। এটাই ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা। উপন্যাসে দেখা যায বিজ্ঞলির এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি তার পরিবারের লোকেরা। অহনা, অম্বর হাসিমুখে এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। এখানে কল্যাণী ভট্টাচার্যের প্রকৃত আধনিক মনোভাবের পরিচ্য পাও্যা যায়। বিজুলীকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়ে অহনা খুব খুশি না হলেও বিজুলির মাধ্যমে অহনার সেল্ফ আইডেন্টিটি গড়ার সাধ পূরণ হয়। যেভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তার প্রবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে যায় অপূর্ণ সাধ- স্বপু, উত্তরসূরির মাধ্যমে নিজের সব ইচ্ছে-আকাজ্ফার পরিপূর্ণতা ঘটায়, তেমনভাবেই বিজুলী অহনার স্বপুকে সত্যি করেছে। ভৌগোলিক সীমার পরিধি ছাড়িয়ে বহির্জগতে পা রাখার মধ্য দিয়ে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজ্ঞায় এই প্রজন্মের নারী যেন সবকিছু ছাড়িয়ে, তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে। উপন্যাসের একমাত্র বিজ্ঞলী চরিত্রটিই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণতাকে কাটিযে উঠতে পেরেছে।

লংতরাই পাহাড়ে ভ্রমণের সময় অহনার সাথে দেখা হয় উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র কিঙ্কিনি চৌধুরীর। এই চরিত্রটি সম্পর্কে অধ্যাপক শিশির কুমার সিংহ বলেছেন,

"কিঙ্কিনি একটি অদ্ভুত চরিত্র যে উপন্যাসের কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।"^৭

বড়লোক পিতা-মাতার আদুরে কন্যা কিঙ্কিনি। আত্মকেন্দ্রিকতার পরিণাম হিসেবে পৃথক বাস করা বাবা মায়ের অবসাদগ্রস্ত কন্যা সে। শিক্ষা, গান-বাজনা, খেলাধুলা, লেখালেখি- সবকিছুতেই অনন্যা এই সাহসী অপরূপ সুন্দরি পর্ব-১, সংখ্যা-৪, মার্চ, ২০২৫ আত্মদীপ

নারী ভালোবাসার কাঙাল। একাকীত্বের যন্ত্রণা ঘোচাতে তাই সে নিজেকে জড়িয়ে রাখে নানান সমাজ সেবামূলক কাজে, যা তার জীবনে ডেকে আনে চরম বিপর্যয়। বাইক নিয়ে লংতরাই পাহাড়ের জঙ্গলে ঘোরাঘুরির সময় বিকল হয়ে পড়ে তার বাইক। এই পরিস্থিতিতে অহনার সাথে তার পরিচয়। অহনার সাথে সে চলে আসে লংতরাই কুইন লজে। অহনার ঘরেই তার রাত্রি যাপন হয়। অলপ সময়েই এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলে অহনা। দুজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কিঙ্কিনি চরিত্রের নানা বর্ণময় দিক উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিঙ্কিনির জানার আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিধি বহু শাখায় বিস্তৃত। কখনো সে ধলাই নদীকে নিয়ে কবিতা রচনা করে, কখনো পৃথিবীর পরাধীন দেশ বা গোষ্ঠী সমূহ অর্থাৎ ফোর্থ ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে জানতে চায়। তার সহজ অমায়িক আচরণ এবং দুর্নিবার সাহস অহনার পাশাপাশি পাঠককেও মুগ্ধ করে। আধুনিক গতিশীল পৃথিবীর সার্থক প্রতিনিধি যেন কিঙ্কিনি।

কিন্তু এই ভ্রম উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দূর হয়ে যায়। নারী যত স্বাধীনভাবে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তত বেশি তাকে খাঁচায় বন্দি করার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করে। কিঙ্কিনি বিশ্বাস করে তার ভেতরে দুটি সত্তার বাস। একটি সত্তা ভালোবাসা, আদর, সহানুভূতি পেতে ও দিতে আগ্রহী। অন্যটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বযসী'দের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌবনের জযগান গেযে সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে এগিযে যেতে চায়। অজানা অচেনাকে জানতে, কুড়েমি- আলস্যকে ভেঙে তোলপাড় করে সবকিছু চিনতে, বুঝতে চায়। এই চারিত্রিক ় বৈশিষ্ট্য তার জীবনে নিয়ে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ। বিবিধ বিষয়ে আগ্রহী ও বহু ভাষা জানার কারণে পুলিশের মনে তার প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হ্য। কিঙ্কিনির বাইকের বক্সে থাকা বই, ডাইরি এই সন্দেহকে আরো সুদৃঢ় করে। তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার দৌরাঅ প্রচন্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সীমা ছাড়ায়। একদিকে উগ্রপন্থীদের ভয় অন্যদিকে পুলিশের অকারণ সন্দেহ সাধারণ মানুষকে অসহায় করে তুলেছিল। কিঙ্কিনি এই সন্দেহের শিকার। আমাদের সমাত্রে একজন পুরুষের বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘোরাফেরা, গভীর রাত ্র অব্দি ঘরে আনন্দোল্লাস করা ইত্যাদি সাধারণ বিষয় হলেও সেখানে পুরুষের জায়গায় নারী হলেই সমস্যা বেঁধে যায়। কারণ তাদের সংজ্ঞা তারা মানুষ ন্য, তারা পুরুষ ও নারী। আর নারীর এসব আচরণ সমাজের চোখে অত্যন্ত গহিত অপরাধ। প্রশাসনও সমাজেরই অংশ। তাই রাত এগারোটায় কিঙ্কিনি চৌধুরীকে ঘরে হইহুল্লোড় করার অপরাধে আইনবহির্ভূত কৌশলে পুলিশ এরেস্ট করে নিয়ে যায়। পরদিন সংবাদপত্তে তার নামের আগে যুক্ত হয় 'আভারওয়ার্ল্ডের কুইন', 'মিফ্লিরানি' ইত্যাদি অপমানজনক বিশেষণ। তাজা তারুণ্যে ভরপুর কিঙ্কিনির অপ্রতিরোধ্য মনোভাবের ফলে পুলিশে তদন্ত ও অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তদন্তে জানা যায়, কিঙ্কিনি বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যক্ত।

চিরকাল সমাজ নারীকে দুটি রূপে দেখতে চেয়েছে- লক্ষ্মী ও উর্বশী। নারীকে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে নারাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কেউ লক্ষ্মী বা উর্বশী - কোনরূপই গ্রহণ করতে না চাইলেও জোর করে তাকে যেকোনো একটি স্থানে বসানোর চেষ্টা করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসের কিঙ্কিনি এই কৌশলেরই শিকার। মহিলা সম্মেলনের চাঁদা তুলতে গিয়ে এক কোম্পানির মালিকের ফাঁদে পড়ে যায় সে। বেশি টাকা চাঁদা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে ছিঁড়ে খুবলে খায় কিছু মাঝবয়সী তথাকথিত 'ভদ্রলোক'। এরপর বারবার তাকে ব্যাকমেইল করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। বিনিময়ে দেওয়া হয় বেশ কিছু টাকা। আত্মসচেতন কিঙ্কিনি তার সাথে হওয়া এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে নিজের মত করে,

'আমার কিছু অস্ত্র কেনার প্ল্যান ছিল। প্ল্যান ছিল মেয়েদের শরীরটাকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলার পর টাকার বান্ডিল দিয়ে নিজেদের মহত্ত্ব দেখাতে বড় বড় কথা বলে, ওদের মুখোশ খুলে ফেলার'।৮

এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য সে স্বেচ্ছায় নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় যার স্বীকারোক্তি পুলিশি জেরায় উঠে আসে। একটি নারীর চরিত্র যতটা সম্ভব কালিমা লিপ্ত করা যায়, পুলিশ প্রশাসন ও মিডিয়া তা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্যবোধ করেনি। অথচ যেসব তথাকথিত 'শিক্ষিত ভদ্রলোক' টাকার বিনিময়ে তাকে ব্যবহার করেছে, তারা বুক ফুলিয়ে সমাজের মাথা হিসেবে বাস করছে। কেউ কেউ পুলিশী জেলায় অবলীলায় বলে দিয়েছে,

'পুরুষের কি প্রস্টিটিউটের কাছে যাওয়া বা কলগার্ল ডাকা বেআইনি? টাকা দেই, এনজয় করি'। যুগ যুগান্তর ধরে পুরুষ সমাজ এভাবে নিজেদের কাম চরিতার্থ করার জন্য নারীকে পাঁকে নামিয়েছে, নোংরা করেছে। আর নিজেরা থেকেছে শুল, অকলঙ্কিত। সমাজআরোপিত এই অভিশপ্ত জীবন বহু নারীকে অন্ধকারে পচে মরতে বাধ্য করেছে। ঔপন্যাসিক কল্যাণী ভট্টাচার্য আধুনিকতার আড়ালে মানবসন্তার অবমাননার এই চিত্রটি নিখুঁতভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি মূল্যবোধের উত্তরণও দেখিয়েছেন। উপন্যাসে অসমীয়া যুবক রূপান্তর সাঁইকিয়া ও কিঙ্কিনির বিবাহ প্রচলিত মধ্যযুগীয় ভাবনার বদল ঘটিয়েছে, যা তৎকালীন সময়ে প্রায় অভাবনীয় ছিল। একদা দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আসামি নারীকে সমাজ সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি, পারেনা। সেখানে দাঁড়িয়ে কিঙ্কিনিরপান্তরের বিবাহ এক সামাজিক অভুত্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। শরীর নিয়ে প্রচলিত স্টিরিওটাইপ থেকে বেরিয়ে মানবতার জয়গান গেয়েছেন কল্যাণী। কিঙ্কিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার এটাও শপথ নিয়েছে, তার সাথে ঘটে যাওয়া যে অন্যায়গুলো আরো শত শত মেয়ের সাথেও ঘটছে, এগুলোর সে প্রতিকার করার চেষ্টা করবে। এই কাজে সে পাশে পেয়েছে রূপান্তরকে। নারীর অবস্থান সম্পর্কে কিঙ্কিনি চরিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে অমোঘ সত্যটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক,

"মেয়ে মানে কি শুধু শরীর? ওদের বুদ্ধি তাদের মেধা বা বিচারবোধ এসব কিছুই নয়? তোমাদেরটা যদি ফোর্থ ওয়ার্ল্ড লড়াই হয় তবে আমার লড়াই মেয়েদের মানুষ বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যুদ্ধটা ফিফ্থ ওয়ার্ল্ড এর লড়াই। মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে মানুষ হওয়ার লড়াই"। ১০

এই কয়েকটি কথার মধ্য দিয়েই যেন নারীসমাজের চিরকালীন সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা কল্যাণী ভট্টাচার্য উপন্যাসে আধুনিক জীবনের আরেকটি দিককে উপস্থাপিত করেছেন। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে এখনো সমাজ আন্তরিকভাবে আপন করে নিতে পারেনি। বিভিন্ন আইনি পদ্ধতিতে তাদের নিজেদের অধিকার আদায় করতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক কল্যাণী তাঁর উপন্যাসে সেই অবহেলিত, বঞ্চিত মানবজাতিকে সম্নেহে গ্রহণ করেছেন। অরণ্য চরিত্রটির মাধ্যমে তাদের বঞ্চনার কথা, আক্ষেপের কথা, অস্তিত্বের সংকটের কথা বিবৃত করেছেন তিনি,

'পশুরও একটা সম্মান আছে মাসি। আমাদের মত মানুষের সে সম্মানও নেই। ভারতজুড়ে আজ সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু বলে যারা গলা ফাটাচ্ছে তারা কি একবারও বলেছে নপুংসকরা সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘ?'^{১১}

অথচ, এই অবহেলিত মানুষটাই একটি পথশিশুকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে। কল্যাণী ইতিবাচকতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর উপন্যাসে জীবনের ইতিবাচক পরিণামের কথাই তিনি বলেছেন বারবার। অরণ্যের মতো মানুষদেরও সবাই একদিন আপন করে নেবে এই বিশ্বাস তিনি রাখেন। উপন্যাসের ভাষা ও ভাবনা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বিমল চক্রবর্তীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,

'তাঁর উপন্যামের ভাষা ও আঙ্গিকে নীলিমার এক গহন পরাগ খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় শান্তি ও নৈঃশব্দ। সচিত্র অন্ধকার থেকে তিনি আলোর দিকে হাঁটেন। দিনের সীমান্তে আলো জ্বালেন। সংসারের মায়া -পুতুলের জন্য। মায়ার গহন গৃঢ় বাড়ি তৈরি করে তিনি কমল বনের হাওয়া বয়ে আনেন। বয়ে আনেন নানা স্বপ্ন।'১২

কল্যাণী ভট্টাচার্য 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসে তিনটি প্রজন্মের 'কুইন' বা রানিদের তুলে ধরেছেন। তারা বাস্তব জীবনে কুইন হতে না পারলেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। কুমারী যাজ্ঞসেনীর সমাজসেবা, পিসিমার নীরব আত্মত্যাগ, অহনার নিজস্ব জগত সৃষ্টি, কিঙ্কিনির প্রতিবাদী সন্তা, বিজুলীর স্বাধীন চিন্তাভাবনা- এই সমস্ত দিকগুলির মাধ্যমে নারীর উত্তরণের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসিক। সামাজিক স্টিরিওটাইপ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কল্যাণীর প্রকৃত আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক। কল্যাণী ভট্টাচার্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গড়া সামাজিক তত্ত্ব, ধারণা, বিধিনিষেধ ও মূল্যবোধের শিকল ভেঙে নারীর নিজস্ব বোধের নির্মাণ করেছেন। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও নারীর অসহায়তাকে পরিস্ফুট করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। এভাবে একুশ শতকের নারীসমাজের এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে।

তথ্যসূত্র:

- ১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ত্রিপুরার কথাসাহিত্য, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ১৮।
- ২. ভটাচার্য, কল্যাণী, লংতরাই কুইন, মানবী শারদ সংখ্যা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২, পুঃ ৩৯।
- ৩. তদেব, পৃঃ ৪৫।
- ৪. তদেব, পঃ ৭৪।
- ৫. তদেব, পঃ ৯৮।
- ৬. তদেব, পৃঃ ৬৪।
- ৭. সিংহ, ড. শিশির কুমার, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৮, পঃ ৩৫১।
- ৮ তদেব, পৃঃ ৭১।
- ৯. তদেব, পৃঃ ৭২।
- ১০. তদেব, পঃ ৮৮।
- ১১. তদেব, পৃঃ ৩।
- ১২. চক্রবর্তী, বিমল, ত্রিপুরার উপন্যাস শিল্প: পাঠ প্রতিক্রিয়ার সূচনা পর্ব, ধর গোবিন্দ (সম্পাঃ), স্রোত-ত্রিপুরার উপন্যাস সংখ্যা, কুমারঘাট, প্রথম প্রকাশ- মে ২০১৯, পৃঃ ৩৭।

আকর গ্রন্থ-

ভট্টাচার্য, কল্যাণী, লংতরাই কুইন, মানবী শারদ সংখ্যা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২। সহায়ক গ্রন্থ-

- ১. ভটাচার্য, তপোধীর, ত্রিপুরার কথাসাহিত্য, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২১।
- ২. সিংহ, ড. শিশির কুমার, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৮।
- ৩. ধর, গোবিন্দ (সম্পাঃ), স্রোত- ত্রিপুরার উপন্যাস সংখ্যা, কুমারঘাট, প্রথম প্রকাশ- মে ২০১৯।
- ৪. দাশ নির্মল ড. পটভূমি ত্রিপুরা: দর্পণে দ্বাদশ উপন্যাস, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৮।